রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

নিখিল বিশ্বাস

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা পরিক্রমায় রবীন্দ্রচিত্রের কোন উল্লেখই আমরা দেখি না। এটা নিঃসন্দেহে ক্ষোভের বিষয়। আধুনিক চিত্রকলায় রবীন্দ্রচিত্র আধুনিক বিজ্ঞানদৃষ্টি সম্মত ছবির জগতে একটি বিস্ময়। চিত্রজগতে রবীন্দ্রচিত্র স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়। উত্তর কালেও এই চিত্রের অনুগামী চিত্র প্রচেষ্টা আমরা পাই না আর রবীন্দ্রনাথের আগেও এই ধরণের মিশ্রিত ভাবানুগত চিত্র প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখি না। ক্ল্যাসিক্যাল যুগ পার হয়ে আমরা ভারতীয় চিত্র জগতে ক্ল্যাসিক্যাল এবং রোমান্টিক চিত্র প্রচেষ্টার যুগে এলাম। পরবর্তী অধ্যায় সম্পূর্ণশূন্য, বিশেষ করে ইংরাজ শাসনকালে, এরপর অবনীন্দ্রকাল, যেখানে নানা মতের সার সঙ্কলনে গঠিত মতের চূড়ান্ত প্রকাশ। এরই সমকালীন রবীন্দ্রচিত্র। অবনীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্র-অনুগামী চিত্র প্রচেষ্টা নানা মতের সার সঙ্কলনে গঠিত মতের আওতায় ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক ভাব সাধনায় মগ্ন হলো। ঠিক এই সময় রবীন্দ্রচিত্র ক্লাসিক ধারার সম্পূর্ণ উল্টো রোমান্টিক ভাবের চিত্র সৃষ্টি করলেন। এইচিত্র প্রচেষ্টা অবনীন্দ্রকালীয় চিত্র অপেক্ষা নতুনতর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একক প্রকাশ।

আধুনিক চিত্র চর্চ্চার অধ্যায়গুলির মধ্যেই রবীন্দ্রচিত্রের অবস্থান। বর্ত্তমানে আমরা দেখি যে চিত্রজগতে শিল্পী দুটভাবে প্রকৃতি রাজ্যের সঙ্গে নিজের যোগ সাধন করেছেন। হয় স্বরূপভাবে নয় বিরূপে রবীন্দ্রচিত্র সম্পূর্ণভাবে সহমর্মিতা ভাবাপন্ন। এই ধরণের বলেই রবীন্দ্রচিত্র প্রকৃতির আসল তত্ত্ববস্তুকে স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করেছে। সে প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছে প্রকৃতির নিছক রূপের ওপর, যে কারণে রবীন্দ্রচিত্র প্রথমতঃ প্রকৃতি-সিদ্ধ এবং তা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষালব্ধ বোধশক্তির ওপর নির্ভর করেছে বলে একে আমরা আদিম-কালীয় প্রকৃতি সিদ্ধমুখী বলতে পারি। কিন্তু এই প্রকৃতি-সিদ্ধ মনোভাবই যে চিত্রে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে তা নয়, কারণ বাস্তবতাকেই ভিত্তি করে ছবি কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিবাস্তবতার জগতে প্রবেশ করেছে বলে, সেখানে আমরা মুক্ত সংস্কার-শূন্য ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এ ছাড়া দ্বিতীয়তঃ যে সময় জ্যামিতিক ভঙ্গীময় Two diamentional ছবি দেখছি সেখানে ছবি প্রকৃতির নিছক মুক্ত রূপকেই প্রকাশ করেছে। আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই ধরণের মিশ্রন নেই বললেই হয়।

মুক্ত সংস্কারশূন্য রবীন্দ্রচিত্র নিছক সত্যেরই অনুলেখন। ফাঁকাযুক্তির হীনতা চিত্রকে কলংকিত করেনি। ছবিতে সংস্কারমুক্ত বাস্তবকে রূপ দেবার জন্যে একটিমাত্র রেখার পরিবর্ত্তে বহু সহস্র রেখাও আমরা দেখি। এতে করে এই বিশ্বাসই জন্মে যে সমস্ত খাপছাড়া, অসংবদ্ধ প্রকৃতিপ্রবাহকে একমুখী করে, তাদের মধ্যে সমতা এনে, তাদের ঐক্যে প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃতির আসল সত্য।

ক্লাসিক্যাল আন্দোলনের যে বন্ধন সমাজের দিক থেকে রীতিনীতির দিক থেকে তার সংস্কার থেকে রবীন্দ্রচিত্র সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কারণ ক্লাসিক্যাল সংস্কার অনুযায়ী স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টির যে

আবেগ তার স্ফুরণের অবকাশ থাকতে পারেনা। যে কারণে ক্লাসিক্যাল কালে রোমান্টিক চিত্র প্রচেষ্টা নেই। এই ধরণের রীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রচিত্র একটি বিস্ময়কর আন্দোলন। কারণ তখন পর্য্যন্ত অবনীন্দ্রকালে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক এই দুইভাবে একটা সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা চলছিল। তাদের বিপরীত দিকে রবীন্দ্রচিত্র বেড়ে উঠলো।

অনুভূতির বহিরাগতরূপকে নিছক প্রকৃতি-সিদ্ধরূপে রূপায়িত করতে হলে যে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, বোধশক্তির প্রয়োজন হয়, তার থেকে আধুনিক অনেক শিল্পীই দেউলিয়া, যে কারণে আজকে নিছক আদিম প্রকৃতিগতভাবে অনেকেই চিত্র প্রচেষ্টায় কাজ করেছেন। কিন্তু ছবিতে বুদ্ধিবাদীতার সংস্পর্শে এসে এই প্রকৃতি-সিদ্ধ ভাব ব্যাহত হচ্ছে। বিজ্ঞান সম্মত আইন অনুযায়ী চিত্র প্রচেষ্টার যুগেও রবীন্দ্রচিত্র একক। এখানে একপাশে দেখি সৌন্দর্য্যের প্রখর চেতনাবোধ অন্যপাশে দেখি সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ শিশুভাব, তেজস্বী, সরল সৌন্দর্য্য বুদ্ধির শক্তির প্রমাণ। রবীন্দ্রচিত্র টেকনিকের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে —পণ্ডিতি, কারিগারী তুলিবাদীর শৃংখল মুক্ত অনবদ্য প্রশস্তভাব সহজ সরল রস সৃষ্টি করেছে। আজকের ছবির জগতে যে চেষ্টা চলেছে আদিম চেতনাশক্তিকে, তার নিছক রূপানুশীলকে খুঁজে বার করবার জন্যে, সেখানে এই রবীন্দ্রচিত্র সমসাময়িক আধুনিক প্রাচ্য ও ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের মধ্যে প্রথম পথ প্রদর্শক। আদিম জগতের রূপ খোঁজার দিকে লক্ষ্য দিয়েছিলেন গোঁগ্যা, হাঁরি রুশো, কিন্তু তাঁদের ছবিতে প্রতিভার স্বাক্ষর বর্ত্তমান, কিন্তু রবীন্দ্রচিত্র যেমনি একপাশে আদিম চেতনাশক্তি সম্মিলিত তেমনি বাস্তব ভিত্তি করে সংস্কারশূন্য মুক্তজগতের রস অন্বেষণে ব্যস্ত। প্রতিভাবান শিল্পী ব্যতীত এরূপ দ্বৈতরসকে একত্রীভূত করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। শুধুমাত্র প্রকৃতির, মানুষের, বিভিন্ন প্রকৃতি বস্তুর বাহ্যিক হীন অনুকরণে রবীন্দ্র চিত্র ব্যস্ত নয়, সেখানে খুঁজে পাই ঐকান্তিক আন্তরিকতার, মুক্ত মানবীয় সত্বার বিকাশ। এই আভ্যন্তরিক বিকাশটি ভূষণ-বিদ্যার অনুরূপ রূপে, শিশু চিত্তের অপরিমিত বিস্ময় নিয়ে, রবীন্দ্রচিত্র প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছে। এর কারণে রং এবং রেখার ছন্দে আমরা সাবলীলতার সন্ধান আগে খুঁজে পাই।

বন্ধন মুক্তির যে আবেদন—ধর্ম্মের, সমাজের একটা বন্ধনমূলক গোষ্টিবদ্ধতার গোঁড়ামী থেকে এর প্রকাশ আমরা রবীন্দ্রচিত্রে খুঁজে পাই। এখানে শিল্পী নিঃসঙ্কোচে স্বস্তির, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। সমস্ত কিছু বাধা, সমস্ত কিছু নীতি উদ্ভূত স্বার্থ সংক্রান্তভাব থেকে রবীন্দ্রচিত্র আমাদের একটা চিন্তাগত জগতে উপনীত করে।

একটা পরিবেষ্টনীগত অবস্থা থেকে যখন আর একটা পরিবর্ত্তনীয় আকারের মধ্যে কোন চিন্তার অবস্থান্তর ঘটে তখন সেই অবস্থান্তর একটা সঠিক মাধ্যমের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় আর সেই মাধ্যমটি একটি সক্রিয় মূলতত্ত্বকেই অবলম্বন করে। এই সক্রিয় মূলতত্ত্বগত মাধ্যমটি চলতি ভাবের interaction এর Opposite এবং এর কারণে এই সংঘাতের মধ্যেথেকে একটা নতুন পরিবেষ্টনীর আকার বেড়ে ওঠে। সমকালীন চিত্র-চিন্তা সমাজচিন্তার বিপরীতেই রবীন্দ্রশিল্প একটা মৌলিক ভাবধারা প্রবর্ত্তন করলো। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্বন্ধীয় বাহ্য ঘটনার এবং সামাজিক অবস্থার সক্রিয় ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং আত্মসংবেদনসিদ্ধ যে খেয়ালের মধ্যে এই যে চিন্তাগত ভাববৈষম্য

তার মধ্যে এই পরিবর্ত্তনশীলতার গুণে একটা আধ্যাত্মিক সম্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে শিল্পীই বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একটা সমতা আনেন। এই ভাব বৈষম্যের মধ্যে যে সমতা, সেই সমতা নিশ্চয়ই মৌলিক চিন্তার প্রকাশ। যদিও সেই প্রকাশ চলতি চিন্তা চলতিভাবের বিপরীত। কিন্তু বিপরীত হলেও এই মৌলিক চিন্তার মাধ্যমটি নিশ্চয়ই উৎকর্ষলাঙ্কর, কারণ এই প্রবর্দ্ধনের মধ্যে একটা স্বাধীন চিন্তা বেড়ে ওঠে, যাকে বলা যেতে পারে, 'আইডিয়া'। এই মৌলিকচিন্তা বাস্তব জগতের ভাব প্রকাশক, কারণ বাস্তব জগতের বাইরের প্রকাশটিই মৌলিকচিন্তার নামান্তর। সেইজন্যে রবীন্দ্রচিত্রে নিছক রূপগত চিন্তার একটা মৌলিক প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি মানুষ, প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে একাত্মা। সাধারণতঃ দেখা যায় শিল্পীরা নিজেদের প্রকাশ কৌশলের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আধ্যাত্মিক-মৃত্যু ঘটায়। সেখানে দেখি কৌশল মাধ্যমের আওতায় ছবি বেড়ে উঠেছে, কিন্তু রবীন্দ্রচিত্র 'কৌশল মাধ্যম' অপেক্ষা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই বেশী জোর দিয়ে চিত্র প্রচেষ্টায় রত।

'পাল্লারাম' ছবিটি রবীন্দ্রনাথের একটি সৃষ্টি। মানুষের পরিবেষ্টনীর মধ্যে তার যে জটিল মিশ্রণ তার মধ্যে থেকে 'পাল্লারাম' ছবিটিতে মানুষের সত্তাকে আদিম সজীব প্রাণবন্ত দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করা হয়েছে। যদিও ছবিটি বাস্তবকে মেনে করা হয়েছে, কিন্তু সেই বাস্তব আহরিত হয়েছে নিছক রূপ থেকে। 'সে' প্রথম সংস্করণে ১৩৪৪ বৈশাখ প্রকাশিত বইটিতে নিঃস্বর্গ দৃশ্যটিতে মুক্ত সংস্কারশূন্য বাস্তবতার প্রকাশ। এখানে নিঃস্বর্গ দৃশ্যটির পদ্ধতি বিকৃত হয়েছে, অতিরঞ্জিত হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতভাবে ছবিটির সঙ্গে বাহ্য-বাস্তবতার সঙ্গে আত্মসংবেদন সিদ্ধ-খেয়ালের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিত প্রকাশ। সেই কারণে রং সুন্দরভাবে প্রকৃতিগত এবং পদ্ধতিটি প্রকৃতির সত্য রূপটিকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রচিত্রে শুধু রেখার মাধ্যমে মুখায়বের সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে বিশেষ থেকে বিশ্বজননীতার পদ্ধতির প্রতি রবীন্দ্রপ্রীতি লক্ষ্যণীয়। কারণ সেখানে ব্যক্তিকে ভিত্তি করে তার ভেতরের চরিত্রের সত্যরূপটিকে রবীন্দ্রচিত্র প্রতিফলিত করেছে। রবীন্দ্র- চিত্র কিছু থাপছাড়া চিন্তার প্রকাশ নয়, ছবি বাস্তবকে ভিত্তি করে অতি বাস্তবতার মুক্ত সংস্কারশূন্য-পদ্ধতিতে একটা সেতু নির্ম্মাণ করেছে। কিন্তু এই সেতু নির্ম্মাণটা ঘটেছে আদিম মানবীয়, স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ, পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর।

'নারী' চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের আর একটি সৃষ্ট। যেখানে 'নারী'র অন্তরলীন ভাবটিকে দেখছি একটি নারীর বিশ্বজনীন রূপের মধ্যে। সেখানে প্রকৃতির যে সরলতার বৈশিষ্ট্য, যা ছবিটিকে একটি স্বচ্ছ অনুভূতিময়—প্রতিমূর্ত্তি করতে সাহায্য করেছে, তা চমৎকার ভাবেই ফুটেছে। বাহুল্যতা বোধের বাইরে আর একটি সৃষ্টি 'দুটি পাখী'। ছবিটি ঘনকালো পটভূমিতে রংএ রঙ্গীন দুটি ওষ্টলগ্ন পাখির চিত্র। ছবিটি বাহুল্যতা বোধ বাদে বাস্তবগত ব্যঞ্জনাময় সরল প্রকাশ। আশা করি রবীন্দ্র চিত্র ইদানিংকালে আধুনিক চিত্র মহলে নিশ্চয় এর প্রকৃত রসানুভূতির জন্যে আদরণীয় হবে।